কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট ৫০

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

খসড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫: একটি 'বাংলাদেশ রিফর্ম ওয়াচ' উদ্যোগ

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬ সালের জুন মাসে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করে। প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। দেড় শতাধিক বেসরকারি সংস্থা বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত। নাগরিক প্ল্যাটফর্ম তার সহযোগীদের সমর্থন নিয়ে এসডিজির 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না' প্রত্যয়ের আলোকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয় দৃশ্যমান করতে এবং সেগুলোকে নীতি প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত করতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সংলাপ সম্পর্কে

'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর একটি খসড়া গত ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ অংশীজনদের আলোচনার জন্যে উন্মুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার সুরক্ষা, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করতে একটি স্বাধীন ও কার্যকর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন এই মুহূর্তে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এই প্রেক্ষিতে, সংস্কার প্রক্রিয়ায় বহুমাত্রিক অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং খসড়া অধ্যাদেশটি নিয়ে নাগরিক সমাজের মতামত ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ ঢাকায় একটি নাগরিক সংলাপ আয়োজন করে। আলোচনাটি মূলত দুটি প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়: প্রথমত, পূর্ববর্তী 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯'-এর অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা; এবং দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবিত নতুন অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া বিশ্লেষণ।

এই সংলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রেক্ষাপটে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি)-এর ম্যান্ডেট ও কার্যপরিধি, গঠন এবং স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা বিশ্লেষণ এবং প্রস্তাবিত খসড়াকে কীভাবে আরও কার্যকর করা যায়—বিশেষ করে অনুসন্ধানীয় ক্ষমতা প্রয়োগ এবং ভুক্তভোগী ও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে একে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার বিষয়ে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও আইন বিশেষজ্ঞরা তাদের সুপারিশ তুলে ধরেন।

পর্ব-১ (প্রারম্ভিক কথা)

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রায় ১৬ বছর আগে। এর মধ্যে পতিত সরকারের শাসনামলে প্রতিষ্ঠানটি অতিবাহিত করেছে প্রায় সাড়ে ১৫ বছর। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষা করা। তাদের অধিকার নিশ্চিতে এ প্রতিষ্ঠান জোরালো ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু এ সময়কালে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয় নি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন এ সংস্থাটি। রূঢ় বাস্তবতা হলো, নানা সমস্যায় জর্জরিত এ কমিশন ক্রমান্বয়ে একটি দুর্বল, নখদন্তহীন ও রুগ্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা থেকে প্রতিষ্ঠানটি যাতে উত্তরণ করতে পারে, সে ধরনের কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি টানা চার মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা পূর্ববর্তী রাজনৈতিক সরকার। বরং নিজেদের ইচ্ছামাফিক নিয়োগ দিয়েছে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের। নিয়োগপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানদের অধিকাংশই ছিলেন সরকারের সাবেক কর্মকর্তা। এ কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করুক ক্ষমতাসীনরা এটা কখনোই চান নি। আগামী নির্বাচন-পরবর্তী যে সরকার শাসনভার গ্রহণ করবে, তার কাছে জনগণের প্রত্যাশা তারা এ অবস্থার পরিবর্তন করবেন এবং একটি স্বাধীন ও কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

অথচ এ ধরনের কমিশন নাগরিকদের জন্য অনেক কিছুই করতে পারে। রাষ্ট্রের মানবাধিকার লঙ্ঘনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার কণ্ঠ উচ্চকিত করতে পারে, এসবের নিরসনে সুপারিশ করতে পারে, দায়ীদের আইনী আওতায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ কমিশন প্রতিষ্ঠার

পর বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, সাম্প্রদায়িক নিপীড়নসহ যেসব বড় ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে সেসব ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি। এসব নিয়ে মানবাধিকারকর্মীরা বিভিন্ন সময়ে কমিশনের নির্লিপ্ততার সমালোচনা করেছেন, কিন্তু ফলশ্রুতিতে কমিশনের কর্মকান্ডে কোন পরিবর্তন আসেনি। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গত ৭ নভেম্বর মেয়াদ সমাপ্তির পূর্বেই কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্য সদস্যরা পদত্যাগ করেন। এরপর আর নতুন করে গত প্রায় এক বছরে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ করা হয়নি।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গত এক বছরে বিভিন্ন কমিশন গঠন করেছে যেগুলোর সাথে মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সম্পর্ক আছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত কমিশন গঠিত না হলেও আইন মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় একটি নতুন আইন প্রণয়নের চেষ্টা হাতে নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন সংশোধনের লক্ষ্যে কমিশনের প্রস্তাব আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। উপদেষ্টা পরিষদ 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪'-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে সমন্বয় করে এবং সুইজারল্যান্ড দূতাবাস ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-এর সহযোগিতায় এ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে এটি পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সংস্কার প্রক্রিয়ার লক্ষ্য সব সীমাবদ্ধতা দূর করে কমিশনকে একটি বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা ও কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা পুনঃস্থাপন করা।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে মানবাধিকার কমিশনের যে খসড়া অধ্যাদেশ দেওয়া হয়েছে অতীত অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডে তা কতটা যুক্তিযুক্ত এবং আগামী দিনে তা কতটা টেকসই ও কার্যকর হতে পারবে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে। আগামী দিনে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানবাধিকারের বিষয়গুলো এই কমিশন বাস্তবায়ন করতে পারবে কী না তার মূল্যায়ন করতে হবে। আইনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদার নিরীখে ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খসড়া অধ্যাদেশ নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

খসড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ-২০২৫ এর ওপরে গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এ সংলাপের আয়োজন করে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ। নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশীজন ও প্রতিনিধিদের মতামত জানতে ও তা গ্রথিত করতে এই সংলাপ আয়োজন করা হয়। এই নাগরিক সংলাপে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠিত একাধিক সংস্কার কমিশনের সদস্য, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, উন্নয়নকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী, এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা অংশ নেন।

অতীতে মানবাধিকার কমিশনের কাজ সীমিত ছিল প্রতিবেদন দেওয়ার মধ্যে। পরবর্তীতে প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কোন পদক্ষেপ নেয়া হতো না। অনেক ক্ষেত্রেই মানবাধিকার কমিশন নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করত। এবার নাগরিক সমাজ এমন একটি মানবাধিকার কমিশনের প্রত্যাশা করে যেটি হবে স্বাধীন, নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম এবং সরকারের মর্জির ওপর নির্ভরশীল নয়।

মানবাধিকার কমিশন থাকার ফলে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়েছে কী না, তা নিয়ে সর্বমহলেই প্রশ্ন রয়েছে। অতীতের মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে একটি অর্থবহ ও কার্যকর মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে হবে। এটাই সময়ের দাবী।

মানবাধিকার কমিশনকে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে তুলনীয় হতে হলে যেসব উপাদান থাকতে হবে, খসড়া অধ্যাদেশে তার প্রতিফলন নিশ্চিত করতে হবে। খসড়ায় সেসব মানদণ্ডের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো যেন আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

আইনের খসড়ায় কিছু না কিছু সমস্যা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। মানবাধিকার কমিশনের খসড়া অধ্যাদেশের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু দূর্বলতা রয়েছে। ২০০৯ সালের আইনের তুলনায় খসড়া অধ্যাদেশটি বেশ উন্নত হলেও এখনও এ খসড়ায়

কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে যেন দূর্বলতাগুলোতে দূর করা যায় এবং আইনটি বাস্তবসম্মত ও প্রায়োগিকভাবে কার্যকর হয়। অধ্যাদেশটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার পূর্বে সব ঘাটতি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

পর্ব-২ (ইতিহাস ও অতীত অভিজ্ঞতা)

মানবাধিকার কমিশন গঠনের ইতিহাস

মধ্য-নব্বই দশক থেকেই বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন করার চেষ্টা চলছিল। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সেই সময়ে ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথমবার মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ-২০০৭ ঘোষণা করা হয়। স্মর্তব্য যে, মানবাধিকার কমিশনের ইতিহাস একটি অরাজনৈতিক সরকারের অধীনে শুরু হয়। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার আগে মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশের খসড়া প্রস্তুত হয় এবং সে অধ্যাদেশের অধীনে কমিশন গঠিত হয়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয় এবং কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা নিয়োগপ্রাপ্ত হোন।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালের ৪ জুলাই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ পাস হয়, যেটি ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়। নতুন সরকার সংসদে আইনটি অনুমোদন দেয় যা ২০২৪ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মানবাধিকার কমিশন টিকে ছিল নভেম্বর মাস পর্যন্ত। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ২০২৪ সালের ৭ নভেম্বর মানবাধিকার কমিশন অবলুপ্ত করে। ২০২৪ সালের ৭ নভেম্বর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নাই।

নখদন্তহীন মানবাধিকার কমিশন

অতীতে জাতিকে প্রকৃতপক্ষে একটি নখদন্তহীন মানবাধিকার কমিশন উপহার দেওয়া হয়েছে, যার দাঁতও ছিল না, কামড়ও দিতে পারে নাই। এ কমিশনের দক্ষতা ছিল না, কার্যকারিতা ছিল না। নাগরিক সমাজের দাবির মুখে মানবাধিকার কমিশন দেওয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু এ ধরনের নখদন্তহীন কমিশন জনগণ চায় নি। বরং জনগণের প্রত্যাশা এমন একটি কমিশন যা কার্যকরভাবে তাদের মানবাধিকার রক্ষা করতে সক্ষম।

নখদন্তহীন মানবাধিকার কমিশনের মাথায় মেরুদণ্ডহীন ভালো মানুষকে বসিয়ে দিলে কোন লাভ হবে না। মেরুদণ্ডহীন ভালো মানুষ কোনো দিন অন্য কারও জন্য তাঁর মেরুদণ্ড সোজা করতে পারে না। সে জন্য এ কাজে মেরুদণ্ডহীন ভালো মানুষের প্রয়োজন নেই। সৎ, নীতিবান ও সাহস করে ক্ষমতার সঙ্গে লড়াই করতে পারবে এমন ব্যক্তিই কমিশনের জন্য যথোপযুক্ত।

পতিত কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময়ে মানবাধিকার কমিশন একটি কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছিল। সেই সরকার পতনের পর মানবাধিকার কমিশন শক্তিমত্তার সাথে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে, এমন প্রত্যাশা থাকলেও বাস্তবতা ছিল হতাশাজনক। আইনগত বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও এত দীর্ঘ সময়েও কমিশন গঠনে ব্যর্থতা দেশে মানবাধিকার নিশ্চিতে অন্তর্বর্তী সরকারের সদিচ্ছার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

মানবাধিকার লঙ্ঘণকারীদের পক্ষে ছিল কমিশন

র‍্যাবের গুলিতে পা হারিয়েছিল লিমন। মানবাধিকার কমিশন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দায়মুক্তি দিয়েছিল। মানবাধিকার কমিশন লিমনের পক্ষে না দাঁড়িয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষে দাঁড়িয়েছিল।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতীতের কমিশনগুলো কাজ করতে অস্বীকৃতিও জানিয়েছিল। গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গণগ্রেপ্তার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নিরাপত্তা বাহিনী ভূমিকা রয়েছে এমন সব বিষয়ে কমিশন নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চায়নি।

৬ বছর আগে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় শহীদুল আলমের ওপর যে নির্যাতন হয়, সেটা নিয়ে তার স্ত্রী রেহনুমা আলম মানবাধিকার কমিশনের কাছে অভিযোগ দিয়েছিলেন। কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল। কমিশন মনেও করেনি শহীদুল আলমের সঙ্গে একবার কথা বলা প্রয়োজন। ওই চিঠির বিষয়েও আর কোন খোঁজ কমিশন নেয়নি।

পুলিশি নির্যাতন নিয়ে অনেক অভিযোগ করা হয়েছে। নির্যাতনের পরে পুলিশ মিথ্যা মামলাও দিয়েছে। এসব ঘটনায় কমিশন বলত, মামলা থাকায় তারা কিছু করতে পারবে না।

খসড়া অধ্যাদেশের ধারা-১৩-তে কোনো ব্যক্তি, সরকারি বা রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অন্তর্ভুক্ত হবে কী না, তা স্পষ্ট নয়। এই বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

অধিকারকর্মীদের চুপ করিয়ে দেওয়া হয়

একটি সরকার যখন চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনে লিপ্ত থাকে তখন তাদের গঠিত ও অনুগত মানবাধিকার কমিশন ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। মানবাধিকার কর্মীরা যখন কমিশনের কাছে গিয়েছে তারা তদন্ত করার ক্ষমতা না থাকাসহ নানা অজুহাত দেখিয়েছে, তাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। উল্টো বিভিন্ন সময়ে মানবাধিকার কর্মীদের দোষারোপ করা হয়েছে।

চিঠি পাঠানোতেই সীমাবদ্ধ কমিশন

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলো অতীতের মানবাধিকার কমিশনের কাছ থেকে যথাযথ সহযোগিতা পায়নি। গুমের শিকার ব্যক্তির পরিবার মানবাধিকার কমিশনে কোনো আবেদন করলে কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠাত। ২০১৪ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কমিশন এমন ২৫টি চিঠি পাঠিয়েছিল। এসব চিঠির কোনো জবাব আসে নি, কমিশনও ফলো-আপ করে নি বা এ ধরনের ঘটনার তদন্তের জন্য কোনো সুপারিশও করেনি।

অতীতের শিক্ষা আমলে নিতে হবে

২০০৯ সাল থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের যাত্রার শুরুতে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি কমিশনের প্রধান হওয়ায় জনমনে ধারণা তৈরি হয়েছে যে, এটা মনে হয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সমমর্যাদার কোনো পদ। যেটা এবারের খসড়া অধ্যাদেশেও দেখা যাচ্ছে।

আইনের মাধ্যমে গঠিত মানবাধিকার কমিশনের চেহারা কেমন হবে, কাজ কেমন হবে, আশপাশের দেশে কাজের ক্ষেত্রে সফলতার উদাহরণগুলো কি, তারা কীভাবে সফল হলো, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সফল হয়নি –সেগুলো থেকে শিক্ষা নিতে হবে। পাশের দেশ ভারতে কাশ্মীর ইস্যুতে মানবাধিকার কমিশন সফল হয় না এটা ঠিক, কিন্তু অনেক বড় ইস্যুতে তারা আবার সফল হয়েছে সেটাও অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশে মানবাধিকার কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে সাফল্য দেখাতে পারে নি, তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে তার উদাহরণ একেবারে নেই সেটা ঠিক নয়। কঠিন বিষয়গুলো আমলে নেওয়ার চেষ্টা নতুন খসড়া অধ্যাদেশে দেখা যাচ্ছে না। কেন মানবাধিকার কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামে সফল হয় না, সেখানে কেন কোন আইন কাজ করে না, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো সেখানে কেন কাজ করে না সেগুলো জিজ্ঞাসার জায়গা প্রস্তুত হয়নি।

মানবাধিকার কমিশন এখন সময়ের দাবি

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম এক বছরের আলোচনায় ছিল মব এবং গণপিটুনির ঘটনা। উদ্বেগ ছিল দেশজুড়ে তৈরি হওয়া অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, ধর্ষণ, গণহারে মামলা এবং সংখ্যালঘু ইস্যুতে। গত ৫ আগস্টের গণ অভ্যুত্থানের পর একটি কার্যকর মানবাধিকার কমিশনের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। যে প্রতিষ্ঠানগুলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনবে সেগুলোকে অবহেলা করা হয়েছে। মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনের ক্ষেত্রে কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। মানবাধিকার এখনো লঙ্ঘিত হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। বিনা বিচারে, বিনা তদন্তে হাজারো মানুষ কারাগারে আটক আছেন। তাদের হয়রানি করা হচ্ছে এসব বিষয়ে প্রশ্ন করতে হবে।

গত ১৫ বছরে যত চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে এবং জুলাইয়ে যে হত্যা হয়েছে, এর পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান দায়িত্ব ছিল শক্তিশালী মানবাধিকার কমিশন গঠন, যেটি হয়নি। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিচারের দাবির বিষয়টি এই সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর বদলে গেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই বিষয়ে তাগাদা অনুভব করেনি। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। মব সন্ত্রাস হচ্ছে। রাষ্ট্র সময়মতো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারছে না। এর দায় রাষ্ট্র এড়াতে পারে না।

এক বছর হয়ে গেল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মানবাধিকার কমিশন করলেন না। কেউ বলবেন— সদিচ্ছার অভাব, সৎ সাহসের অভাব, কোনো কিছু লুকানোর কারণ আছে ইত্যাদি কারণে হয়নি। এর সঠিক জবাব পাওয়া যায় নি। আইনিভাবে বাধ্যবাধকতা আছে এবং মানুষের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার অর্পিত দায়িত্ব যাদের হাতে সেই মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়নি। এটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যর্থতা। এখন যারা সরকারের মধ্যে আছেন তাদের সিংহভাগ একসময় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন। সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়। অথচ কেউ সঠিক জবাব দিতে পারছেন না কেন এক্ষেত্রে উদ্যোগ-উদ্যমের অভাব রয়েছে।

দীর্ঘ সময় ধরে মানবাধিকার কমিশন নেতৃত্বহীন অবস্থায় রাখা দুঃখজনক। রাষ্ট্র সংস্কারের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মুখ্য ম্যান্ডেটের সঙ্গে এটা সাংঘর্ষিক। এই শূন্যতার ফলে নাগরিকদের মানবাধিকার ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে।

পর্ব-৩ (খসড়ায় কী কী সংশোধন)

খসড়া প্রণয়ন অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি

মানবাধিকার নিয়ে যারা কাজ করে তারা মানবাধিকার কমিশনের এই খসড়া অধ্যাদেশ প্রস্তুতির আনুষ্ঠানিক কোনো প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল না। এই খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়া তাই অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি। জাতিসংঘের একটি সংস্থা এই খসড়া প্রণয়নে কাজ করেছে। অতীতে দেখা গেছে, জাতিসংঘের সহায়তাপুষ্ট মানবাধিকার কমিশন অতি সরকারঘেঁষা হয়। সরকার যেভাবে বলে সেভাবেই চলে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। ভবিষ্যতেও এমন যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রশ্ন

খসড়া অধ্যাদেশের ধারা-৬-এ কমিশনে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অযোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। সেখানে কোনো ব্যক্তি দ্বৈত নাগরিক হলে কমিশনের সদস্য হতে পারবেন না, সে অযোগ্যতার বিষয়টি রাখা হয়নি। দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকলে তিনি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য হতে পারবেন না, এটি অযোগ্যতার মধ্যে রাখা উচিত বলে আলোচনায় মত আসে।

অপসারণের বিষয়টি সমস্যাগ্রস্ত

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অপসারণের বিষয়টি সমস্যাগ্রস্ত। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করে অপসারণের কথা বলা হয়েছে। ঠিক যেভাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের সরাতে হয়, মানবাধিকার কমিশনের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। প্রায় সবক্ষেত্রেই কমিশনকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমকক্ষ করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। সংবিধানের ১১২ অনুচ্ছেদে বলা আছে, দেশের প্রশাসন কাজ করবে সুপ্রিম কোর্টের সহায়তায়। ধারাবাহিকতা রক্ষার ব্যাপার থাকায় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য অপসারণের জায়গায় কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন বলে আলোচকেরা মত দেন।

তদন্তের সময়সীমা কতদিন

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে নিজ উদ্যোগে বা কেউ অভিযোগ বা আবেদন করলে কমিশনের কার্যক্রম শুরুর কথা বলা হয়েছে। অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা – কমিশনের দুই ধরনের ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। অনুসন্ধানের পর ছয় মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই সময় অনেক বেশি। একটা ঘটনা তদন্তে কোনোভাবেই ছয় মাস সময় লাগার কারণ নেই বলে মনে করেন আলোচকেরা।

শুনানি কতদিন ধরে চলবে

প্রথম ৩০ দিন অনুসন্ধান। এরপর ছয় মাস তদন্ত। এরপর কমিশন উভয়পক্ষের শুনানি গ্রহণ করবে। কতদিন ধরে এই শুনানি চলবে তার সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ১ মাস নাকি ১ বছর ধরে এই শুনানি চলবে? শুনানির সময়সীমা নির্ধারিত না থাকলে এটি একটি অতি দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হওয়ার আশংকা থাকে।

লোকবল ও বাজেট

মানবাধিকার কমিশনের নিজস্ব লোকবল ও সচিবালয়ের বিষয়ে পূর্বেও যেসব আপত্তি ছিল, তা নতুন খসড়া অধ্যাদেশেও দেখা যাচ্ছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কমিশনের কাছে রাখা হয়নি। কমিশনের নিজস্ব লোকবল প্রয়োজন এবং এ নিজস্ব জনবল দিয়ে কীভাবে কাজ করবেন, সেটার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কমিশনের কাছে থাকতে হবে।

মানবাধিকার কমিশনের একটা ফান্ড বা তহবিলের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় বাজেটে এই তহবিল বরাদ্দে কোনো বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। সরকার যা দেয়, বাকিটা সরকারের অনুকম্পার ওপর চলতে হবে। গুরুদায়িত্ব পালনকারী কমিশনের তহবিলের এমন অবস্থা হলে দায়িত্ব পালন করা কঠিন হবে।

যে তহবিলের কথা বলা হয়েছে সে তহবিলের অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব-অনুমোদন লাগবে। মানবাধিকার কমিশন স্বাধীনভাবে তার নিজস্ব তহবিল সংগ্রহে সক্ষম হওয়া উচিত। এছাড়াও যা বাজেট হিসেবে পায় তা পরিবর্তন করতে হবে। বার্ষিক নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কমিশনে নারী সদস্য বৃদ্ধির দাবি

দেশের জনসংখ্যার ৫১ শতাংশ নারী। যত অপরাধ হয় তার ভুক্তভোগী বেশি হয় নারীরা। কমিশনে সদস্য করার বিষয়ে ধারা-৫ (৪) এ বলা হয়েছে, কমিশনারদের মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী হবেন। নারীদের মধ্য থেকে কমিশনার করার ক্ষেত্রে কমপক্ষে শব্দটা প্রযোজ্য হওয়া উচিত না।

তবে কমিশনে নারী, সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হলেও বাস্তবায়নের সময় সেটার প্রতিফলন থাকে না বলে অনেকে মনে করেন। তাই একজন নারী বা একজন আদিবাসীর হবেন এটা শুধু লিখে দিলেই হবে না। তিনি কী সার্বক্ষণিক হবেন নাকি অবৈতনিক হবেন, সেটি সুনির্দিষ্ট করতে হবে। কারও কারও মতে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক নারী সদস্য হওয়া উচিত।

সব সদস্য সার্বক্ষণিক ও একই মর্যাদার

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন–২০০৯ অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং ৫ জন অবৈতনিক সদস্যের সমন্বয়ে মানবাধিকার কমিশন গঠনের বিধান ছিল।

নতুন খসড়া অধ্যাদেশে কমিশন গঠনের ধারায় বলা আছে, ৩ জন সদস্য হবেন সার্বক্ষণিক আর ৩ জন হবেন অবৈতনিক। কেউ কেউ দাবি করেছেন, ৬ জন সদস্যকেই সার্বক্ষণিক করার।

কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্য সব সদস্য একই মর্যাদার, সার্বক্ষণিক ও পূর্ণকালীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশ্বে যেসব দেশে মানবাধিকার কমিশন আছে সেগুলোর কোথাও এমন দৃষ্টান্ত নেই যে একশ্রেণি অবৈতনিক, আবার অন্যশ্রেণি সার্বক্ষণিক। এটা কমিশনের মধ্যে বৈষম্য। কমিশন কাজ করতে পারে না যেসব কারণে তার মধ্যে এটি অন্যতম। এটি থেকে সরে আসতে হবে।

কমিশনারদের বয়স নিয়ে মতভেদ

খসড়া অধ্যাদেশ অনুযায়ী, মানবাধিকার কমিশনার হতে হলে নূন্যতম ৩৫ বছর হতে হবে। এর চেয়ে কম বয়সী কাউকে কমিশনার করা যাবে না। এটি হলে বাংলাদেশের যে জনগোষ্ঠী আগামী ১৫-২০ বছর দেশকে নেতৃত্ব দেবে তাদের অংশগ্রহণ কমিশনে দেখা যাবে না। কমিশনার হওয়ার যোগত্যায় বয়স নূন্যতম ৩০ বছর করা বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আবার কেউ কেউ মনে করেন, কমিশনার নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়স ৭৫ বছর থেকে কমিয়ে ৭০ বছর করা যেতে পারে।

কমিশনের মেয়াদ

আগের মানবাধিকার আইনে কমিশনের মেয়াদ ছিল ৩ বছর। নতুন খসড়া অধ্যাদেশে কমিশনারদের মেয়াদ বলা হয়েছে ৪ বছর। কেউ কেউ এই মেয়াদ ৩ বছর রাখার পক্ষেই মত দেন। তাদের মতে, মেয়াদ কম হওয়া ভালো। না হলে কেউ কেউ কমিশনে গেড়ে বসেন। তবে প্রায় সব অংশীজনের মতে কমিশনাররা এক মেয়াদের জন্যই দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া উচিত। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পাওয়ার জন্য অনেকে চুপ করে থাকেন।

বাছাই কমিটি ও কমিশন গঠনের ত্রুটি

খসড়া অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, বাছাই কমিটি গঠন ও কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে সেটার কোনো কার্যক্রম অবৈধ হবে না এবং সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। এই দুটি উপধারা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। পরবর্তী সরকার অতীতের মতো কমিশন গঠন করে এই উপধারার সুযোগ নিতে পারে। তাই এই দুটি উপধারা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

বাছাই কমিটিতে সদস্যদের মধ্যে অন্তত দুজনকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করবেন। সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্যও বাছাই কমিটির সদস্য হবেন। সংসদ যদি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে তাহলে তিনি ক্ষমতাসীন দল থেকেই আসবেন। ফলে বাছাই কমিটিতে সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার সম্ভাবনা বেশি। বর্তমান এই বাছাই কমিটির মাধ্যমে মেরুদন্ড সম্পন্ন ব্যক্তিরা কমিশনে আসতে পারবেন কী না সেই প্রশ্ন থেকে যায়। ফলে রাষ্ট্রপতির কাছে না থেকে বহুদলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বাছাই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলে ভালো হয়। এতে দলীয় প্রভাব থেকে যাওয়ার শঙ্কা কমবে।

তদন্ত দল গঠনে যোগ্যতা

খসড়া অধ্যাদেশের ২৮ ধারায় তদন্ত দল গঠনের বিষয়ে বলা হয়েছে। তবে তাদের যোগ্যতা ও অতীত ইতিহাস সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। এই বিষয়টিতে স্পষ্টতার প্রয়োজন।

অনুসন্ধান ও তদন্ত

খসড়ায় অনুসন্ধানের জন্য একটা সময় রাখা হয়েছে। এরপর কমিশন তদন্ত করবে। এই অনুসন্ধান পর্বটা অপরিহার্য কী না, সেটি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে সবচেয়ে বেশি অকার্যকর ও ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়াকে ব্যহত করেছে এই অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের আগে তদন্ত করা যায় না। অনুসন্ধান ও তদন্ত দুটি পর্ব করে তদন্ত প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। তাই এটি পুনর্বিবেচনা করা দরকার।

মানবাধিকার কমিশনের জবাবদিহিতা

মানবাধিকার কমিশনেরও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই, আইনেও কিছু বলা নেই। বাছাই কমিটিকেই পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। বাছাই কমিটি বছরে দুবার নির্দিষ্ট মানদন্ড নির্ধারণ সাপেক্ষে মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে ষান্মাষিক প্রতিবেদন দিবে। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গণশুনানির আয়োজন হবে। এতে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে জবাবদিহি নিশ্চিতে চাপ থাকবে।

অন্যান্য দাবি

- বাছাই কমিটি অনূন্য ৪ জন কমিশনারের হবে লেখা হয়েছে এটি "কমিশনার"এর বদলে ৪ জন "সদস্য"এর হবে।
- মানবাধিকার প্রয়োগের লক্ষে খসড়া অধ্যাদেশে সুশীল সমাজের বদলে নাগরিক সমাজ লেখা শ্রেয়।
- খসড়া অধ্যাদেশের ধারা-১৪-তে বলা হয়েছে, অন্য আইনের দায়িত্ব পালনে এই অধ্যাদেশ বাধা হবে না। এই ধারার ফলে মানবাধিকার কমিশনের কাঁধে অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে এই ধারার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।
- কমিশনের সদস্যদের দায়িত্ব গ্রহণের আগেই কোনো কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট বা স্বার্থের সংঘাত রয়েছে কী না সেটার ঘোষণা দিতে হবে।
- খসড়াতে সব জায়গায় 'হি' লিখে সম্বোধন করা হয়েছে। এর পরিবর্তে 'দে' অথবা 'হি'/'শি' বলা উচিত।

- জোরজবরদস্তি করে অন্যের বিশ্বাসকে দমন করার ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। এমন ঘটনায় মানবাধিকার কমিশন স্বপ্রণোদিতভাবে ব্যবস্থা নিতে পারবে সেই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে খসড়া অধ্যাদেশে যুক্ত করতে হবে।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, শ্রম আদালতের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো নির্ধারিত সময়ে মানবাধিকার কমিশনকে প্রতিবেদন জমা দিতে পারে। এমন প্রতিবেদন পেলে কমিশনের পক্ষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে আগাম ব্যবস্থা নিতে সুবিধা হবে।
- খসড়া অধ্যাদেশের ধারা-১৩-তে কমিশনের কার্যাবলী অনেক বেশি বলা হয়েছে। আরও সুনির্দিষ্ট ও ছোট করা না হলে এসব কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে।
- খসড়া অধ্যাদেশের ১৩ (গ) ধারায় একটা শব্দ আছে 'আটক', তার বদলে 'হেফাজত' দিলে ভালো হয়।
- কমিশনে যেসব অভিযোগ আসবে অভিযোগকারীর সম্মতি নিয়ে সেগুলো জনস্বার্থে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। একইভাবে কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদনগুলোও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায় কী না সেটা ভেবে দেখা।
- বাছাই কমিটিরি জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে।
- কমিশনের সিদ্ধান্ত মানার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার আলোচনা ব্যক্তিকেন্দ্রীক। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- অনুসন্ধান ও তদন্ত দুটি পৃথক বিষয়। এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। খসড়া অধ্যাদেশে অনুসন্ধান ও তদন্তের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়নি। দুটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে।

সন্ত্রাস কীভাবে মানবাধিকারের পক্ষে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় সেটা নিয়ে মানবাধিকার কমিশন সুপারিশের কথা বলা হয়েছে। অথচ, সন্ত্রাস দমন আইনটি অনেক ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। সন্ত্রাস দমন আইন ব্যবহার কেন মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে না, সেটি কমিশনের দেখতে হবে।

আগের আইনের চেয়ে ভালো

- নতুন খসড়া অধ্যাদেশে আগের আইনের চেয়ে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে যাতে মানবাধিকার কমিশন স্বতন্ত্র, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক হতে পারে। পূর্ণকালীন সদস্য বাড়ানো হয়েছে। বাছাই প্রক্রিয়া ভালো হয়েছে। আবেদন উন্মুক্ত ও সাক্ষাৎকার ভিত্তিক হবে।
- মানবাধিকার কমিশন নিরাপত্তা বাহিনীর বিষয়ে তদন্ত করতে পারবে না, সেই ধারা পুরো বাতিল করা হয়েছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন।
- ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- প্রতিকারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে আছে। একটা তহবিল থাকবে, যেখান থেকে কমিশন ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে।
- কমিশনের আদেশ পালনে বাধ্যবাধকতা যুক্ত হয়েছে। আগে কমিশন তদন্ত করত, সুপারিশ দিতো, কিন্তু না মানলে কিছুই করার ছিল না।
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকলেও খসড়া অধ্যাদেশে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।
- ২০০৯ সালের তুলনায় এবারের নতুন খসড়া অধ্যাদেশে মানবাধিকার কমিশনকে নির্বাহী ক্ষমতা বেশি দেওয়া হয়েছে।

পর্ব-৪ (খসড়া নিয়ে সাধারণ দাবি)

সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া যাবে না

অতীতের অকার্যকর মানবাধিকার কমিশনগুলোতে সরকারি কর্মকর্তাদের আধিক্য ছিল। কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগের কারণে পুরো কমিশনের ব্যাপারটাই হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়। কমিশনের কার্যকর না হওয়ার পেছনে এটা একটা বড় কারণ। স্বার্থের সংঘাতকে অতীতে আমলে নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িতদের কমিশনে অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়ে সবাই একমত প্রকাশ করেন।

বৈষম্যবিরোধী আইন দ্রুত পাস করতে হবে

বৈষম্য থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বেশি ঘটে। যেসব বিষয়ের ওপর ব্যক্তির কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সেসব বিষয়কে কোনো কিছুর মাপকাঠি করাই হচ্ছে বৈষম্য। যেমন ব্যক্তি নারী নাকি পুরুষ হিসেবে জন্ম নেবেন বা হিন্দু নাকি মুসলমান কোন পরিবারে ব্যক্তির জন্ম হবে, সেটির নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির হাতে থাকে না। এই বিষয়গুলোকে কোনো কিছুর মাপকাঠি করা হলে তা হবে বৈষম্য।

বেশ কয়েক বছর আগে দেশে বৈষম্য বিলোপ আইনের খসড়া হয়েছিল, কিন্তু এখনো তা আলোর মুখ দেখেনি। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেই বৈষম্যবিরোধী আইন অনুমোদন দেওয়া উচিত। পরবর্তী সংসদে যেন এই বৈষম্যবিরোধী আইন অনুসমর্থন করা হয়।

সবাইকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে

মানবাধিকার কমিশনকে স্বাধীনসত্তা হতে হবে। কোনো ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যেমন নিরাপত্তা বাহিনী, সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা যেন কমিশনের জবাবদিহির আওতার বাইরে না থাকে। আগে একটাই কথা বলা হতো যে, নিরাপত্তা বাহিনীর বিষয়ে কমিশন কাজ করতে পারে না, এবার সেটা খসড়ায় বাদ দেওয়া হয়েছে।

গত ১৫ বছরে গুম, খুন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারি সংস্থা জড়িত ছিল। গোয়েন্দা সংস্থা, নিরাপত্তা বাহিনীর সংস্কার নিয়ে খুব বেশি আলোচনা দেখা যাচ্ছে না। মানবাধিকার লঙ্ঘনে তাদের ভূমিকা ছিল। এ আশংকা এখনও আছে। খসড়া অধ্যাদেশে এই বিষয়গুলো স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

যেসব অভিযোগে নিরাপত্তা বাহিনী জড়িত, সেগুলো নিয়ে কমিশন কাজ করতে চায় না। সাম্প্রদায়িক কোনো বিষয় থাকলে সেগুলো নিয়েও কমিশন চাপে পরবে ভেবে কাজ করত না। যারা মানবাধিকার কমিশনে থাকবেন তাদের অধিকারই যদি খর্বিত হয়, তারা কার কাছে যাবেন। ২০০৯ সাল থেকে যারা মানবাধিকার কমিশনে এসেছিলেন তাদের অনেকেই কাজ করতে চেয়েছিলেন। নিরাপত্তা বাহিনী, সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলোতে তারা অন্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেতেন না। এমনকি কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে আইন প্রয়োগকারীর সংস্থার বিরুদ্ধে আসা অভিযোগুলো প্রকাশ করা হতো না।

কোনো দেশের মানবাধিকার নিশ্চিত করা ছাড়া জাতীয় নিরাপত্তা পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত না করলে জাতীয় নিরাপত্তা কল্পনাও করা যায় না। তাই নিরাপত্তা সংস্থা, সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ারে আনতে হবে। এতে তাদের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বাংলাদেশে যত মানবাধিকার লঙ্ঘন ধারাবাহিকভাবে ঘটেছে, তার অনেকগুলোরই কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ডিজিএফআই, এনএসআই, ডিবি, এনটিএমসি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এসব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

শৃঙ্খলা বাহিনীর সংজ্ঞা থাকতে হবে

খসড়া অধ্যাদেশে শৃঙ্খলা বাহিনীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। শৃঙ্খলা বাহিনীর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা লাগবে। শৃঙ্খলা বাহিনী অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ১৫২ (১) ধারায় বর্ণিত শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, যৌথবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, কোস্ট গার্ড, গোয়েন্দা সংস্থা ও অনুরূপ কোনো সংস্থা। এই সংজ্ঞা খসড়া অধ্যাদেশের প্রারম্ভিকে যুক্ত করা জরুরি।

জেলা-উপজেলায় কার্যালয়

প্রত্যন্ত এলাকার লোকজন মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে কম জানেন। খসড়া অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, কমিশনের প্রধান কার্যালয় হবে ঢাকায়। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলায় কার্যালয় স্থাপন করা যাবে। এই 'প্রয়োজন' শব্দটি অস্পষ্টতার জন্ম দিয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আবশ্যিকভাবে মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয় থাকা উচিত।

প্রবাসীদের মানবাধিকার সুরক্ষা

বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশেই মানবাধিকার পরিস্থিতি নাজুক। বাংলাদেশ থেকে কাজ, পড়ালেখার জন্য এখন অনেকেই বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে। বিদেশে বাংলাদেশি নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কী করণীয় থাকবে সে বিষয়ে খসড়া অধ্যাদেশে কিছু বলা নেই।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়ত এমন কোনো দেশের সঙ্গে চুক্তি করল যেখানে বাংলাদেশি শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে পারে। মানবাধিকার কমিশন যেন এসব চুক্তির বিষয়ে দেখভাল করতে পারে, তা অধ্যাদেশে যুক্ত করা প্রয়োজন।

ন্যায়পাল নিযুক্ত হয়নি ৫৪ বছরেও

১৯৭২ সালের সংবিধানে ন্যায়পাল বলে একটি পদ রয়েছে। কিন্তু ৫৪ বছরেও ন্যায়পাল নিয়োগ হয়নি। রাষ্ট্রের কর্মচারীদের বিষয়ে অভিযোগ ন্যায়পালের কাছে যাবার কথা। মানবাধিকার কমিশন সেগুলো নিয়ে কাজ করবে। মানবাধিকার কমিশন রাষ্ট্রের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এবং তৃতীয় পক্ষের দ্বারা সংগঠিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় রাষ্ট্র কী পদক্ষেপ নিয়েছে, সেগুলোর বিষয়ে ভূমিকা পালন করবে।

কল্পনা চাকমা গুমের বিচার এবারও হলো না

কল্পনা চাকমা গুম ও খুনের বিচার এত বছরেও হয়নি। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিশেষ রাজনৈতিক কোনো স্বার্থ নাই। মানবাধিকার কর্মীরা আশা করেছিলেন, এই সরকার কল্পনা চাকমা গুম ও খুনের ঘটনার বিচার করবে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধানের চারপাশের অনেকেই আছেন যাদের এ বিষয়ে আগ্রহ নেই।

নিয়োগের বিষয়ে আরও স্পষ্টতা লাগবে

কোন মানদন্ডে কাকে নিয়োগ দেওয়া হবে সেই বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট করা উচিত। মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অতীতের কাজ রয়েছে কী না সেটি দেখতে হবে। চেয়ারপারসন ও কমিশনারদের নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

বাছাই কমিটি যেসব উপযুক্ত শর্ত বা মানদন্ডগুলো দেখে নির্বাচন করবেন সেগুলো সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা দরকার। বিশেষ করে সংগঠনগত ক্ষেত্রে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং অতীতের কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে হবে। পেশাগত জীবনে তারা কতটুকু মানবাধিকারের প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন বা কতটুকু এর বিপরীতে কাজ করতেন সেসব বিবেচনায় নিতে হবে।

শ্রমিকদের মানবাধিকার উপেক্ষিত

দেশে সাত কোটির মতো শ্রমিক। খসড়া অধ্যাদেশে শ্রমিকদের অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে দেখানো হয়নি। শ্রমিকেরা দাবি আদায়ে আন্দোলন করলে মালিকপক্ষ মিথ্যা মামলা দেয়। একটা পর্যায়ে গিয়ে মামলার কার্যক্রম শেষে শ্রমিকেরা হয়ত খালাস পায়। মাঝের এই সময়ে শ্রমিকদের যে মানবাধিকার লঙ্ঘণ হয়, সেটি জানানোর কোনো জায়গা থাকে না।

শ্রম আদালতে ছয় মাসের মধ্যে মামলার কার্যক্রম শেষ করার কথা, কিন্তু বছরের পর বছর ধরে মামলা চলতে থাকে। এই সময়ে শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় এসব নিয়ে মানবাধিকার কমিশনের যাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে।

পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা

পাহাড় ও সমতলের মধ্যে মানবাধিকারের অদৃশ্য দেয়াল তুলে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে। পাহাড়ের ক্ষেত্রে মানবাধিকার শব্দটা উচ্চারণও করা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে বড় সমস্যা ভূমি। ভূমি নিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘণের অনেক ঘটনাই ঘটে থাকে। ভূমির বিষয়গুলো খসড়া অধ্যাদেশে উঠে আসেনি।

বিশেষায়িত পৃথক কমিশন

শ্রমিক, দলিত এবং বিভিন্ন আদিবাসীর জন্য মানবাধিকার কমিশনে কিছু থিমেটিক গ্রপ করা হয়েছিল। সেটার প্রতিফলন খসড়া অধ্যাদেশে নেই। বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার কমিশন থাকার পরেও পৃথক সংখ্যালঘু কমিশন, নারী অধিকার কমিশন রয়েছে। বাংলাদেশেও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নিয়ে বিশেষায়িত পৃথক কমিশন করা যেতে পারে।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আইনি সংজ্ঞা প্রয়োজন

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কোন আইনি সংজ্ঞা খসড়া অধ্যাদেশে দেওয়া নেই। আদিবাসীর চেয়ে দলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি। অনগ্রসর শব্দটি নিয়েও আপত্তি আছে। অনগ্রসরের চেয়ে পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত বা অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এমন ভাষাগত পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

জনসেবক নাকি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী

সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে, পাবলিক সার্ভেন্টের অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। এই খসড়ায় বাংলা করা হয়েছে জনসেবক। সংবিধানে সুস্পষ্ট অর্থ থাকার পরেও কেন এটাকে জনসেবক করতে হবে? কর্মচারী শব্দটা সরকারি আমলাদের অনেকে তাদের জন্য পর্যাপ্ত সম্মানজনক মনে করেন না। জনসেবক শব্দটা অগ্রহণযোগ্য কারণ তারা যে রাষ্ট্রের কর্মচারী এই বিষয়টা এ শব্দের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

নাগরিক সমাজের সঙ্গে কীভাবে কাজ হবে

খসড়া অধ্যাদেশে কমিশনে অভিযোগ জানানোর অংশটিতেও স্পষ্টতা প্রয়োজন। নাগরিক সংগঠনের সঙ্গে কমিশন কীভাবে কাজ করবে সেটা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। নাগরিক সংগঠনগুলো অভিযোগ জানাতে পারবে, তদন্তে সহায়তা করতে পারবে তা স্পষ্ট করে বলতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষায় সীমিত অর্জন

মানবাধিকার কমিশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কিছু কাজ করার চেষ্টা করলেও সেগুলি পূর্ণতা ও সফলতা পায়নি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেখভাল করবে। আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় বেশ কিছু শক্তিশালী কমিটি করার কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে মানবাধিকার কমিশনকে অনুরোধ করা হয়েছিল। এই বিষয়ে কমিশন চেষ্টা করেও সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে পারেনি।

দেশের জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ মানুষ প্রতিবন্ধী। মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। প্রতিবন্ধী শব্দটিকে মন্ত্রণালয় যে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে চাচ্ছে, তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অপমানজনক।

ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি ফৌজদারি দায়

কমিশনকে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে সহায়তা প্রদানে ব্যর্থ হলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের পাশাপাশি ফৌজাদারি দায়ও থাকা উচিত।

সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কমিশনের আদেশ পালন না করলে বার্ষিক গোপন প্রতিবেদনে (এসিআর) উল্লেখ করা হবে। যারা সরকারি কর্মচারী নন তাদের ক্ষেত্রে কী হবে? এদের ক্ষেত্রে ফৌজদারি দায় থাকা উচিত। ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা পরিশোধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা উচিত। তবে ক্ষতিপূরণ কারা দিবে সেটা স্পষ্ট না। কমিশন নিজ ফান্ড থেকে দিবে নাকি যে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে তার কাছ থেকে আদায় করে দিবে সেটা সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন।

সালিশ বা মধ্যস্ততা কখন হবে

সালিশ বা মধ্যস্ততার বিষয়টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কার ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যেখানে অপরাধ হয়েছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, সেখানে এই সমঝোতা কতটা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারবে তা নিয়ে সন্দেহ থাকে।

খসড়ায় শিশুদের কথা নেই

মানবাধিকার কমিশনের খসড়া অধ্যাদেশে শিশুদের দু:খ, কষ্ট, অধিকার লঙ্ঘনের কথা আসেনি। অতীতে একটি শিশু কমিশন গঠন করার কথা আলোচনা হয়েছিল। সরকার বারবার বিষয়টিতে সম্মতি দিলেও কাজ হয়নি। মানবাধিকার কমিশন থেকে বলা হয়েছিল, পরবর্তী সংশোধনীর সময় শিশু কমিশনের বিষয়টি ভাবা হবে। সে হিসেবে এই খসড়া অধ্যাদেশ প্রস্তুতের সময়টিই এ বিষয়ে আলোচনার জন্য উপযুক্ত সময়।

নতুন খসড়ার আরও কিছু দুর্বলতা

- অধ্যাদেশের প্রারম্ভিক অংশে বলা হয়েছে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। সেসব সনদের কোন উল্লেখ নেই। পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেসব সনদের নাম যুক্ত করা প্রয়োজন।
- জরুরি সময়ে কমিশনের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা খসড়ায় উল্লেখ নেই।
- কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি জাতীয় সংসদের কাছে হওয়া উচিত।
- কমিশন সালিশযোগ্য অভিযোগে মধ্যস্ততা করবে এ কথা বলা হয়েছে। এই মধ্যস্ততা কারা করবেন সেটি উল্লেখ নেই। তারা কী কমিশনার হবেন নাকি বিশেষজ্ঞরা এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করবে, তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

পর্ব-৫ (প্রত্যাশা ও আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ)

মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানবাধিকার কমিশনগুলোর তিন ধরনের ক্ষমতা বা এখতিয়ার রয়েছে। প্রথমত, মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, কমিশন অভিযোগ তদন্ত করে দেখে কারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। আর তৃতীয়ত, যারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে কী না সেটি দেখে। মানবাধিকার কমিশন মূলত সুপারিশ করার প্রতিষ্ঠান যাদের সীমিতভাবে তদন্ত করার ক্ষমতা থাকে। অপরাধমূলক ঘটনায় তদন্ত করার ক্ষমতা থাকে না। অপরাধ হলে তদন্তের ক্ষমতা পুলিশের।

খসড়া অধ্যাদেশে মানবাধিকার কমিশনকে দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কমিশনের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার এখতিয়ার থাকবে। বিশ্বের কোথাও মানবাধিকার কমিশন এমন ক্ষমতা ব্যবহার করে না। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি জটিল হবে কমিশনের জন্য। খসড়া দেখে মনে হচ্ছে, মানবাধিকার কমিশনের কাছে সবার অনেক প্রত্যাশা। প্রত্যাশা কমাতে হবে যদি তা বাস্তবসম্মত না হয়।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা

কোনো দেশে মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার নূন্যতম মানদণ্ড কি হবে তা বলা হয়েছে ১৯৯৩ সালের প্যারিস নীতিমালায়। এতে বলা হয়েছে, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই নিরপেক্ষ ও স্বাধীন হতে হবে। প্যারিস নীতিমালা অনুযায়ী, জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোর বড় পরিসরের ম্যান্ডেট ও পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এর আওতায় এ সংস্থা যে কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত, তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ, সরকার ও নাগরিক সমাজের পক্ষগুলোর সঙ্গে কাজ করতে পারবে, এবং তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল ও সুপারিশ জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারবে।

প্যারিস নীতিমালা অনুসারে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অবশ্যই পর্যাপ্ত সম্পদ থাকতে হবে যাতে তারা স্বাধীনভাবে, বাইরের প্রভাব ও ভয়-ভীতি এবং আর্থিক বিধিনিষেধের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত থেকে নিজেদের কাজ করতে পারে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের খসড়া অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্যারিস নীতিমালায় উল্লেখিত মানদন্ড অনুসরণ করতে হবে। এসব মানদন্ড অনুসরণ করলে কমিশন সরকারকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হবে।

পর্ব-৬ (অধ্যাদেশের আইনী অনুমোদন ও রাজনৈতিক মতৈক্য তৈরী)

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এই খসড়া অধ্যাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশঙ্কা আছে। পরবর্তী সরকারের প্রথম সংসদ অধিবেশনের একমাসের মধ্যে আইন পাস করা না হলে এই অধ্যাদেশ বাতিল হয়ে যাবে।[১] বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করবে কিনা তা দেখার বিষয়।

বর্তমান সরকারের সময়কালে গুম প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রস্তুত করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের খসড়া অধ্যাদেশের ১৪ নাম্বার ধারা অনুযায়ী এই আইন বাস্তবায়নের এখতিয়ার কমিশনকে দেওয়া হয়েছে।

মানবাধিকার বাস্তবায়নের বিষয়টি রাজনৈতিক চর্চা, আচরণ ও অনুশীলনের সঙ্গে জড়িত। মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্ব বিপন্ন মানুষের অধিকার সুরক্ষা দেওয়া ও রাজনৈতিক অনুশীলনকে সঠিক পথে রাখা। বিচার ব্যবস্থাকে রক্ষা কবচ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এটি শুধু মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশের বিষয় না, সামগ্রিকভাবে সমাজ সংস্কারের বিষয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সংস্কার রাষ্ট্র সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

খসড়া অধ্যাদেশের ধারা-১৩-তে বলা হয়েছে, সরকার কমিশনের লিখিত অনুরোধ ব্যতিরেকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী/ব্যক্তিকে কমিশনে প্রেষণে পদায়ন করতে পারবে। অর্থাৎ কমিশন আবারও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার আশংকা থেকে যাচ্ছে। মানবাধিকার কমিশনকে নিজস্ব নিয়োগ বিধি পরিপালনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আগামীর নবনির্বাচিত সরকার একটি শক্তিশালী মানবাধিকার কমিশন গঠনের বিষয়টিকে একটি সুযোগ হিসাবে দেখতে পারেন। এর মাধ্যমে একটি সুশাসনভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন হতে পারে। নাগরিক সমাজ আশা করে আগামী নির্বাচিত সরকার এর মাধ্যমে সর্বস্তরে একটি কঠিন বার্তা পৌঁছে দিতে পারেন। যে বার্তা বলবে, বাংলাদেশের প্রকৃত মালিক এদেশের জনগণ, আর জনগণের সুরক্ষার মধ্যেই নিহিত আছে রাষ্ট্রের চরিত্র কি হবে এবং বাংলাদেশ একটি সত্যিকার অর্থেই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে তার ভবিষ্যত বিনির্মাণ করতে সার্থক ও সক্ষম হবে কিনা।

---

[১]জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (মূল অধ্যাদেশ): ৯ নভেম্বর ২০২৫ (গেজেটে প্রকাশিত)। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫: ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ (বিশেষ গেজেটে প্রকাশিত)।
সংবিধানের অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা সম্বলিত ৯৩(২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, "এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতোপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সভাপতি

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম
ও
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সম্মানিত আলোচকবৃন্দ

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
ব্যারিস্টার সারা হোসেন, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
সানজিদা ইসলাম, সংগঠক, মায়ের ডাক
নাদিরা ইয়াসমিন, অধিকারকর্মী ও সম্পাদক, 'নারী অঙ্গন'
জনাব খন্দকার জহুরুল আলম, নির্বাহী পরিচালক,
সেন্টার ফর সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফরমেশন অন ডিজ্যাবিলিটি (সিএসআইডি)
অ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা, মানবাধিকার কর্মী ও আইনজীবী
কল্পনা আক্তার, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (বিজিআইডব্লিউএফ) এবং
সদস্য, নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন
রানী ইয়ান ইয়ান, উপদেষ্টা, চাকমা সার্কেল প্রধান এবং আদিবাসী মানবাধিকার রক্ষাকর্মী
শিরীন পারভিন হক, প্রধান, নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন
বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী, সভাপতি, গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন
ড. শাহদীন মালিক, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং সদস্য, সিপিডি ট্রাস্টি বোর্ড
মোসফিকুর রহমান জোহান, যুগ্ম আহ্বায়ক, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)
অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, আইনজীবী এবং রাজনীতিবীদ
অ্যাডভোকেট মো: মতিউর রহমান আকন্দ, আইনজীবী এবং রাজনীতিবীদ
ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এবং
কমিশন প্রধান, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংস্কার কমিশন

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: **জনাব মো: সামছুর রহমান**, ম্যানেজার (মিডিয়া রিলেশনস), ফরথট পিআর।

আয়োজনে

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs Citizen'sPlatformforSDGsBangladesh bdplatform4sdgs

সেপ্টেম্বর ২০২৬

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net